বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল ; কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল ; কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের ওপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উম্মত ঃ هُوَ اجْتَبَاكُمْ—হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরায়শকে, অতঃপর কুরায়শের মধ্য থেকে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।---(মুসলিম, মাযহারী)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'---এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গোনাহ্ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হত না।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের ওপর আরোপিত হয়েছিল। কোরআন পাকে একে إِصْر ও أَغْلَال শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোন বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন ঃ সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতই না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় ; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোন কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায় ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেন ঃ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের

মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ جعلت قرة عينى فى الصلوة অর্থাৎ নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। —(আহ্মদ, নাসায়ী, হাকিম)

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ—অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরায়শী মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এরপর কুরায়শদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফযীলতে শামিল হয়; যেমন হাদীসে আছে ঃ الناس تبع لقريش فى هذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم —অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরায়শদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরায়শীদের অনুগামী এবং কাফির কাফির কুরায়শীর অনুগামী।---(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সা) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মু'মিনীন' অর্থাৎ মু'মিনদের মাতা। নবী করীম (সা) যে হযরত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا—অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমই কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ – কোরআনে মু'মিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন; কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম (আ)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ—অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার

করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের ওপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবেঃ আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই; কিন্তু আমরা আমাদের রসূল (সা)-এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবূল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ---উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এ স্থলে শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ---অর্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেনঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেনঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহ্কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছেঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله

আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত। ---(মাযহারী)

سورة المؤمنون

সূরা আল-মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ রুকূ, ১১৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧
وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানা-ভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

সূরা মু'মিনূনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঃ মসনদে-আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়ায শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম।

ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে বেশি দাও---কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর---লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর---বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের ওপর অগ্রাধিকার দাও---অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিও না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এক্ষুণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এই দশটি আয়াত পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযীদ ইবনে বাবনূস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ তাঁর চরিত্র অর্থাৎ স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।---(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় সেইসব মুসলমান (পরকালে) সফলকাম হয়েছে, যারা (বিশ্বাস শুদ্ধ-করণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত; অর্থাৎ তারা) নামাযে (ফরয হোক কিংবা নফল ইত্যাদি) বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক বিষয়াদি থেকে (উক্তিগত হোক কিংবা কর্মগতভাবে হোক) বিরত থাকে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) তাদের আত্মশুদ্ধি করে এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে অবৈধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে) সংযত রাখে; তবে তাদের স্ত্রী ও (শরীয়তসম্মত) দাসীদের ক্ষেত্রে (সংযত রাখে না); কেননা, (এ ব্যাপারে) তারা তিরস্কৃত হবে না। হ্যাঁ, যারা এগুলো ছাড়া (অন্যত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) ইচ্ছুক হবে, তারা (শরীয়তের) সীমালংঘনকারী হবে। এবং যারা (গচ্ছিত) আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি (যা কোন কাজ-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা এমনিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে করে) মনোযোগ থাকে এবং যারা তাদের (ফরয) নামায-সমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা (সুউচ্চ) ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

فلاح (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামূস) এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশি কোন কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতের কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌنِ الَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى—অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ

সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে ঃ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى---অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোট কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে---দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা---এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব মু'মিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু'মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে---এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফির ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সুস্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহিযগার সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই; অর্থাৎ মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের ওপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ ঃ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই ঃ

প্রথম, নামাযে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া। 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন

কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা। ---(বয়ানুল কোরআন) বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাযের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যে সব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশূ। হাদীসে হযরত আবূ যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নামাযের সময় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।---(আহমাদ, নাসায়ী আবূ দাউদ---মাযহারী) নবী করীম (সা) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন ঃ সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রূক্ষেপ করো না।---(বায়হাকী মাযহারী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ لو خضع قلب هذا لخشعت جوا رحه অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত।---(মাযহারী)

নামাযে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর ঃ ইমাম গাযযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশূ ফরয। সম্পূর্ণ নামায খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাযই হবে না। অন্যেরা বলেছেন ঃ খুশূ নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামায নিষ্প্রাণ; কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাযই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরয।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয নয়; কিন্তু নামায কবূল হওয়া এর ওপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরয। তাবরানী 'মু'জামে-কবীরে' হযরত আবূ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোন খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না।---(বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ণ মু'মিনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ—لغو-এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তর গোনাহ্, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই

ক্ষতি বরং বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার্হ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه---অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মু'মিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি---মদীনায় হিজরতের পর ফরয করা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ---এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ---উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যাঁরা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে 'যাকাত' শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে ايتاء الزكوة ও يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ---ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ---বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এছাড়া فاعلون শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فعل (কাজ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত فعل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ। فاعلون শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে যাকাতের পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে যাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরয, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরযই; কেননা, শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ্। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়ত-সম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ --অর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে---জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। واللّٰه اعلم

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ---অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন যিনা----তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা---এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে اِسْتِمْنَاء بِالْيَد অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।---(বয়ানুল কোরআন, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়---হুকূকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকূকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়া থেকে আত্মরক্ষা

করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হিফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হিফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে العدة دين অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া ঃ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রূহুল-মা'আনী) এখানে صلوات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صلوة শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক---নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব

গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মু'মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ---উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। قد افلح বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا
كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي
الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ
مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَ
شَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ
لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি; অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি; এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ খাদ্য) থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্য অর্জিত হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যা (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ গর্ভাশয়ে) অবস্থান করেছে (তা খাদ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর আমি বীর্যকে জমাট রক্ত করেছি। এরপর জমাট রক্তকে (মাংসের) পিণ্ড করেছি। এরপর আমি পিণ্ডকে (অর্থাৎ পিণ্ডের কতক অংশকে) অস্থি করেছি। এরপর অস্থিকে মাংস পরিধান করিয়েছি। (ফলে অস্থি আবৃত হয়ে গেছে। এরপর (অর্থাৎ এসব বিবর্তনের পর) আমি (তাতে রূহ্ নিক্ষেপ করে) তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। (যা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে খুবই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কারণ, ইতিপূর্বে একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব বিবর্তন হচ্ছিল, এখন তা একটি প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে।) অতএব শ্রেষ্ঠতম কারিগর আল্লাহ্ কত মহান! (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহে জোড়াতালি দিয়েই কোন কিছু তৈরি করতে পারে। জীবন সৃষ্টি করা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। বীর্যের উপর উল্লিখিত বিবর্তনসমূহ এই ক্রমানুসারেই 'কানূন' ইত্যাদি চিকিৎসা-গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত হচ্ছে)।

অতঃপর তোমরা (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। (অতঃপর পুনরুত্থান বর্ণিত হচ্ছেঃ) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। (আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করেছি, তেমনি তোমাদের স্থায়িত্বের বন্দোবস্তও করেছি। সেমতে) আমি তোমাদের উর্ধ্বে সপ্তাকাশ (যেগুলোতে ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সাথে তোমাদেরও কিছু কিছু উপকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে।) এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেখবর ছিলাম না; (বরং প্রত্যেক সৃষ্টিকে উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ব ও ক্রমবিকাশের জন্য) আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা (কিছুকাল পর্যন্ত) ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি (সেমতে কিছু পানি ভূভাগের ওপরে এবং কিছু পানি অভ্যন্তরে চলে যায়, যা মাঝে মাঝে বের হতে থাকে)। আমি (যেমন তা বর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্থাৎ পানি) বিলোপ করে দিতে (ও) সক্ষম (বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে হোক কিংবা মৃত্তিকার সুগভীর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে হোক, যেখান থেকে তোমরা যন্ত্রপাতির সাহায্যেও উত্তোলন করতে না পার। কিন্তু আমি পানি অব্যাহত রেখেছি।) অতঃপর আমি তা (অর্থাৎ পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি; তোমাদের জন্য এতে প্রচুর মেওয়াও আছে (টাটকা খাওয়া হলে এগুলোকে মেওয়া মনে করা হয়)। এবং তা থেকে (যা শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাকে খাদ্য হিসেবে) তোমরা আহারও কর এবং (এই পানি দ্বারা) এক (যয়তুন) বৃক্ষও (আমি সৃষ্টি করেছি) যা সিনাই পর্বতে (প্রচুর পরিমাণে) জন্মায় এবং যা তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন নিয়ে। (অর্থাৎ এই বৃক্ষের ফল দ্বারা উভয় প্রকার উপকার লাভ হয়। বাতি জ্বালানোর এবং মালিশ করার কাজেও লাগে এবং রুটি ডুবিয়ে খাওয়ার কাজেও লাগে। উল্লিখিত ব্যবস্থাদি পানি ও উদ্ভিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়) এবং (অতঃপর জীবজন্তুর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন উপকার বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু (অর্থাৎ দুধ) পান করতে দেই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চুল ও পশম কাজে লাগে।) এবং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণও কর। তাদের (মধ্যে যেগুলো বোঝা বহনের যোগ্য, তাদের) পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা (ও) কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত

হয়েছে, যাতে পরিষ্কার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

سلالة—ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين অর্থ সারাংশ এবং طين অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ثم جعلنا ه نطفة বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তফসীরবিদ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سلالة من طين বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। والله اعلم

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর سلالة من طين অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ্ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব ঃ তফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত উমর ফারূক (রা) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন ঃ রমযানের কোন্ তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমীরুল-মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন ঃ এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মসনদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লিখিত আছে ঃ

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ---এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ أَبّ জন্তুদের খাদ্য।

কোরআন পাকের ভাষালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি ঃ বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও فَ অব্যয় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোন কোন বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় না। সেমতে কোরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে---প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলেছে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানব-বুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির ওপর মাংসের প্রলেপ হওয়া---এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فَ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ্ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ ثُمَّ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ্ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বুদ্ধির দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অব্যয় فَ প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহ্র কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা ঃ কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে ঃ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ

خَلْقًا اٰخَرَ—অর্থাৎ আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদান ও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত অর্থাৎ রূহ্ জগত তথা রূহ্ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ্ ও জৈব রূহ্ঃ এখানে خَلْقًا اٰخَرَ—এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ্ বলে জৈব রূহ্ বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ্ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে-আরওয়াহ্' তথা রূহ্ জগত থেকে প্রকৃত রূহ্কে এনে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহ্কে মানব-সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ্ তা'আলা এসব রূহ্কে সমবেত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহ্র প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ্ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে; এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহ্ও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ—خلق ও تخليق এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ কারিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি

দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টি-কর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছেঃ تَخْلُقُونَ إِفْكًا হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছেঃ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ —এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خَالِقِينَ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। والله اعلم

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ—পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছেঃ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ—অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আয়াতে আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ—طرائق শব্দটি طريقة এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طريقة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ—এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং

তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ -

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থী। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহ্র কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌঁছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন ধূলা বালু এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু পৌঁছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোন আশংকা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা

বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ-গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্গুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কোরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্য وَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ এ ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ যয়তুন বৃক্ষের জন্য বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন: তুফানে নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন।---(মাযহারী)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا অর্থাৎ এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্য পাক সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে ঃ শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশ্তও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

تُحْمَلُونَ —চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকার হুকুম রাখে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
مَلَائِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ

فَتَرَبَّصُوا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾ فَاَوْحَيْنَآ
اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ
فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ
اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ
الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾

(২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবূদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না? (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির-প্রধানরা বলেছিল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর ; কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। (২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল ঃ হে পালনকর্তা আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্ব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাজসরঞ্জাম সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর তার

আধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধর্মীয় সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) এবং আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম। সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (যখন একথা প্রমাণিত, তখন) তোমরা কি (অপরকে উপাস্য করতে) ভয় কর না? অতঃপর [নূহ (আ)-এর একথা শুনে] তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে) বলল ঃ এ তো তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বৈ (রসূল ইত্যাদি) নয়। (এই দাবীর পেছনে) তার (আসল) মতলব তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করা (অর্থাৎ জাঁক-জমক ও সম্মান লাভই তার লক্ষ্য) যদি আল্লাহ্ (রসূল প্রেরণ করতে) চাইতেন, তবে (এ কাজের জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। (সুতরাং তার দাবী মিথ্যা। তওহীদের দাওয়াতও তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা, আমরা এরূপ কথা (যে, অন্য কাউকে উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও) শুনিনি। বস্তুত, সে একজন উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। (তাই সারা জাহানের বিরুদ্ধে কথা বলে যে, সে রসূল এবং উপাস্য এক।) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময়) পর্যন্ত তার (অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব পাপ ঘুচে যাবে।) নূহ [(আ) তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর দরবারে] আরয করল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি (তাঁর দোয়া কবুল করে) তাঁর কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। (কারণ, এখন প্লাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও ঈমানদাররা নিরাপদ থাকবে।) এরপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ (নিকটে) আসে এবং (এর আলামত এই যে,) ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রকার (জন্তুর মধ্য) থেকে (যা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে জীবিত থাকতে পারে না, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদি) এক এক জোড়া (নর ও মাদা) এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও (সওয়ার করিয়ে নাও), তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, তারা নিমজ্জিত হবে) তাদের ছাড়া। (অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে কাফির, তাকে নৌকায় সওয়ার করো না।) এবং (শুনে রাখ যে, আযাব আসার সময়) আমার কাছে কাফিরদের (মুক্তি) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না। (কেননা,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার (মুসলমান) সঙ্গীরা নৌকায় বসে যাবে, তখন বল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে কাফিরদের (দুষ্কৃতি) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং (যখন প্লাবন থেমে যাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও বল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণকরভাবে (স্থলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্তায় রেখো।) তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী (অর্থাৎ অন্য যারা মেহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির শক্তি রাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ।) এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনায় বুদ্ধিমানদের

জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নিদর্শন জানিয়ে দিয়ে আমার বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করি (যে, কে এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং কে হয় না। নিদর্শনাবলী এই ঃ রসূল প্রেরণ করা, মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা, কাফিরদেরকে ধ্বংস করা, হঠাৎ প্লাবন সৃষ্টি করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تنور—وَفَارَ التَّنُّوْرُ চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। তফসীরের সার সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই নূহ (আ)-এর জন্য মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল। —(মাযহারী)। হযরত নূহ (আ) তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم
مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾
قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ
غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সেকি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) তিনি বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ্‌ বললেন ঃ কিছু দিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপর (অর্থাৎ কওমে-নূহের পর) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম (এরা আদ অথবা সামূদ সম্প্রদায়) এবং আমি তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। [ইনি হূদ অথবা সালেহ (আ) পয়গম্বর, বলেছিলেন ঃ] তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নাই। তোমরা কি (শিরককে) ভয় কর না? তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলাম, তারা বলল ঃ বাস, সে তো তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষ। (সেমতে) তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ, তখন) তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা (বুদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ এটা খুবই নির্বুদ্ধিতা।) সে কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং (মরে) মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে গেলে (মাংসল অংশ মৃত্তিকা হয়ে গেলে অস্থিসমূহ মাংসবিহীন থেকে যায়। কিছুদিন পর তাও মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে যে, এ অবস্থায় পৌঁছে গেলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরূপ ব্যক্তিও কি অনুসরণীয় হতে

পারে?) খুবই অবান্তর, যা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব জীবনই। কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মলাভ করে। আমরা পুনরুত্থিত হব না। এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (যে, তিনি তাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।) আমরা তো কখনও তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয়গম্বর দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ বললেন ঃ কিছুদিনের মধ্যে তারা অনুতপ্ত হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর শব্দ (অথবা মহা-আযাব) তাদেরকে পাকড়াও করল। (ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর (ধ্বংস করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যাতাড়িত আবর্জনা (-এর মত) পদ-দলিত করে দিলাম। অতএব আল্লাহর গযব কাফিরদের ওপর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিদায়তের আলোচনা প্রসঙ্গে নূহ্ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেন ঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আদ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হূদ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ্ (আ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَة অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে قُرُونًا اٰخَرِيْنَ বলে সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَة শব্দের অর্থ আযাব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফিরই ; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً
رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ
فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ۙ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا
إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্টকালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তার রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ আদ ও সামূদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার) পরে আমি আরও বহু উম্মত সৃষ্টি করেছি। (রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তারাও

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যে মুদ্দত আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত ছিল,) কোন উম্মত (তাদের মধ্য থেকে) তার নির্দিষ্ট মুদ্দতের (ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে) আগে যেতে পারত না এবং (সেই মুদ্দত থেকে) পশ্চাতেও যেতে পারত না; (বরং ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। মোটকথা, প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়,) এরপর আমি (তাদের কাছে) একের পর এক আমার রসূল (হিদায়তের জন্যে) প্রেরণ করেছি; (যেমন তাদেরকেও একের পর এক সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর (বিশেষ) রসূল (আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমি (-ও ধ্বংস করার ব্যাপারে) তাদের একের পর একেকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্থাৎ তারা এমন নেস্তনাবুদ হয়েছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) সুতরাং ধ্বংস হোক তারা, যারা (পয়গম্বরগণের বোঝানোর পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো না। অতঃপর আমি মূসা (আ) ও তার ভাই হারূন (আ)-কে আমার নির্দেশাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। (বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হওয়া তো জানাই রয়েছে।) অতঃপর তারা (তাদেরকে সত্যবাদী বলতে ও আনুগত্য করতে) অহংকার করল এবং তারা ছিল প্রকৃতই উদ্ধত। (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল। সেমতে) তারা (পরস্পরে) বলল ঃ আমরা কি আমাদের মতই দুই ব্যক্তিতে (যাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বলতে কোনকিছু নেই) বিশ্বাস স্থাপন করব (এবং তাদের অনুগত হয়ে যাব,) অথচ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা (স্বয়ং) আমাদের অনুগত? (অর্থাৎ আমরা তো স্বয়ং তাদের নেতা। এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি? তারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে পার্থিব নেতৃত্বের সাথে এক করে দেখেছে যে, তারা যেহেতু এক প্রকার নেতৃত্বের অর্থাৎ পার্থিব নেতৃত্বের অধিকারী। কাজেই অন্য প্রকার নেতৃত্বেরও তারাই অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন পার্থিব নেতৃত্ব পায়নি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিরূপে পেতে পারে?) তারা উভয়কে মিথ্যাবাদীই বলতে লাগল। ফলে (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমি মূসা (আ)-কে কিতাব (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে (তার মাধ্যমে) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল) হিদায়ত লাভ করে এবং আমি (আমার কুদরত ও তওহীদ বোঝানোর জন্যে এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়তের জন্য) মারইয়াম-তনয় [ঈসা (আ)]-কে এবং তার মাতা (মারইয়াম)-কে আমার কুদরতের ও তাদের সত্যতার) বড় নিদর্শন করেছিলাম (পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উভয়েরই বড় নিদর্শন ছিল) এবং (যেহেতু তাঁকে পয়গম্বর করা লক্ষ্য ছিল এবং জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ শৈশবেই তাঁকে হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে) তাদেরকে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানযোগ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যামল ছিল।

(ফলে তিনি শাস্তিতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তখন তওহীদ ও রিসালতের দাবীতে তাঁকে সত্যবাদী মনে করা জরুরী ছিল ; কিন্তু কেউ কেউ করেনি।)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾
فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ
فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ
وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

(৫১) হে রসূলগণ, পবিত্রবস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা ; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? বরং তারা বোঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গম্বরকে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পয়গম্বরগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উম্মতগণ) পবিত্র বস্তু আহার কর (কারণ, তা আল্লাহ্‌র নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর ; অর্থাৎ সৎ কাজ কর (অর্থাৎ ইবাদত)। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতগণের। কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং (এই তরিকার সারমর্ম এই যে) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ

করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের স্রষ্টা ও মালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগত্যই দাবী করে।) কিন্তু (এর ফলশ্রুতি হিসেবে সবাই উল্লিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরিকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সন্তুষ্ট। (বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ খুলে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ওপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিণামে তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে। ফলে আযাব বাড়বে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طيبات - يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا-এর

আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। দুই, সৎকর্ম কর। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলিমগণ বলেন ঃ এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎ কর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্র সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?---(কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً — أُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا — زُبُر শব্দটি زَبُور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরিকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زُبُر শব্দটি কোন সময় زُبْرَةٌ এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

---

(৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক

করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে ; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহ্‌র পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান করা সত্ত্বেও) তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে ; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিল না। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর শুভ পরিণতি নিশ্চিত। কেননা) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি জুলুম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِيتَاء শব্দটি يُؤْتُونَ—وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিরাআত يَأْتُونَ مَا أَتَوا ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত, নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে ; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম ; যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে? তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে সিদ্দীকতনয়া, এরূপ নয় ; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহ্‌র কাছে (আমাদের কোন

ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এধরনের লোকই সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা---মাযহারী), হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎ কাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না।---(কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ দ্রুত সৎকাজ

করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا
عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾
لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سَامِرًا
تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ
يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ
بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ
الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে। (৬৪) এমন কি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোক-দেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চিৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে (৬৭) অহং-কার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃ-পুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পর-কাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে মুমিনদের অবস্থা শুনলে; কিন্তু কাফিররা এরূপ নয়;) বরং (এর বিপরীতে,) কাফিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে (যা بِآيَاتِ رَبِّهِمْ -এ উল্লিখিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (তাদের অবস্থা فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ

আয়াতেও জানা গেছে)। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিত্র) কাজ আছে, যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আযাব দ্বারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোটকথা, যখন তাদের সবার ওপর আযাব নাযিল হবে) তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অস্বীকৃতি ও অহঙ্কার কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা প্রতিদান জগৎ---কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম-জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রসূলের মুখে) পাঠ করে শোনানো হত, তখন তোমরা দম্ভভরে এই কোরআন সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উল্টোপায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যাদু বলতে এবং কেউ কবিতা বলতে। সুতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ কি?) তারা কি এই (আল্লাহ্‌র) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি? (যাতে এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী আসা, যা নতুন কিছু নয়। চিরকালই পয়গম্বরদের মাধ্যমে উম্মতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে; যেমন এক আয়াতে আছে مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

সুতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও অসার প্রতিপন্ন হল। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রসূল সম্পর্কে (অর্থাৎ রসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অস্বীকার করে? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত।) না (কারণ এই যে,) তারা (নাউযুবিল্লাহ্) বলে যে, সে পাগল? (রসূল যে উচ্চ-স্তরের বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট। অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপসন্দ করে। (ব্যস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ। বস্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক;

যেমন এক আয়াতে আছে قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ

هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ) এবং (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হত এবং) সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী (ও অনুকূলে) হত, তবে (সারা বিশ্বে কুফরেরই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহ্‌র গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার গযবও সবার ওপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্ঞও ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবূল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবূল না করাই স্বয়ং অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপসন্দ করারই দোষ নয়;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে; অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। ব্যস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ করেছি; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চান? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে ওপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে! (উদ্দেশ্য এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের দাবী করে এবং অন্তরায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় ঈমান না আনা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হঠকারী যে, শরীয়তের নিদর্শনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীবত ও গযবের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হয় না, যদিও বিপদ মুহূর্তে আমাকে আহবান করে; কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেমতে) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় যে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিল, সব খতম হয়ে যাবে; যেমন এ আয়াতে আছে--- اِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ অন্য আয়াতে আছে اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا الخ

الْفُلْكِ الخ —এর প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে) আমি তাদেরকে আযাবে গ্রেফতারও করেছি; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরাপুরি) নত হয়নি এবং কাকুতি-মিনতিও করেনি। (সুতরাং ঠিক বিপদমুহূর্তেও যখন---বিপদও এমন কঠোর, যাকে আযাব বলা চলে; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল---তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরূপ আশা করাই বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নির্ভীকতা অভ্যন্ত বিপদাপদ পর্যন্তই থাকবে।) অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দেব (যা হবে অলৌকিক, দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গযব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো অবশ্যম্ভাবী হবে), তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হল? তখন সব নেশা উধাও হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

غَمْرَةٌ —এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غمرة শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غمرة বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছত না।

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ—অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيهِمْ শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আযাব বোঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের ওপর পতিত হয়েছিল।

কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসূলে করীম (সা) কাফিরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের ওপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন— اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف (বুখারী, মুসলিম—কুরতুবী)

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে بِهِ শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরায়শদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরায়শদের আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধান-জনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُونَ—শব্দটি هَجْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা বলত।

এশার পর কিস্সাকাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ ঃ রাত্রিকালে কিস্সা কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সাকাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহ্সমূহের কাফফারাও

হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়, এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও কত রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যূষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন ঃ শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে।---(কুরতুবী)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ থেকে أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ—অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে —শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ—অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই, কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) সম্ভ্রান্ততম কুরায়শ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তার যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র

কাফির সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'—সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

— وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষের আযাব এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল ঃ আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের ওপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ الخ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া ও অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।—(মাযহারী)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾
بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾
قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ
وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ
اِلٰهٍ ۭ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

(৭৮) তিনি তোমাদের কান চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন ; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে ঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেওয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে ঃ সবই আল্লাহ্‌র। বলুন ঃ তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন ঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌। বলুন তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলন ঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে

কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌র। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে? (৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবূদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবূদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্য জনের ওপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা যাকে শরীক করে, তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন (শক্তিশালী ও নিয়ামতদাতা), যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন (যাতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর। কিন্তু) তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক। (কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ করা এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার না করাই ছিল প্রকৃত শোকর।) তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা সবাই (কিয়ামতে) তাঁরই কাছে সমবেত হবে। (তখন নিয়ামত অস্বীকার করার স্বরূপ জানতে পারবে।) তিনি এমন, যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাত্রি ও দিবসের বিবর্তন তারই কাজ। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? (যে, এসব প্রমাণ তওহীদ ও কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দুই-ই বোঝায়। কিন্তু তবুও মান না।) বরং তারা তেমনি বলে, যেমন পূর্ববর্তীরা বলত। (অর্থাৎ) তারা বলেঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হব? এই ওয়াদা তো আমাদেরকে এবং (আমাদের) পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কল্পিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে। (এই উক্তি দ্বারা আল্লাহর শক্তিসামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে এবং পুনরুত্থানের অস্বীকৃতির ন্যায় তওহীদেরও অস্বীকৃতি হয়। তাই এর জওয়াবে শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করার সাথে সাথে তওহীদও প্রমাণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ) আপনি (জওয়াবে) বলুনঃ (আচ্ছা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা খবর রাখ। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌র। বলুনঃ তবে চিন্তা কর না কেন? (যাতে পুনরুত্থানের ক্ষমতা ও তওহীদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে যায়।) আপনি আরও বলুনঃ (আচ্ছা বল তো,) সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এটাও আল্লাহ্‌র। বলুন, তবে তোমরা (তাকে) ভয় কর না কেন? (যাতে কুদরত ও পুনরুত্থানের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতে।) আপনি (তাদেরকে) আরও বলুনঃ যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি কে? এবং তিনি (যাকে ইচ্ছা) আশ্রয় দেন ও তার মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারেন না, যদি তোমরা জান। (তবুও জওয়াবে) তারা অবশ্যই বলবে, এসব গুণও আল্লাহ্‌রই। আপনি (তখন) বলুনঃ তাহলে তোমরা দিশেহারা হচ্ছ কেন? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর; কিন্তু ফলাফল স্বীকার

করনা, যা তওহীদ ও কিয়ামতের বিশ্বাস। অতঃপর তাদের إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ

الْأَوَّلِيْنَ উক্তি বাতিল করা হচ্ছে; অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃতদের জীবিত হওয়া পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি তাদেরকে সত্য বাণী পৌঁছিয়েছি এবং নিশ্চয় তারা (নিজেরা) মিথ্যাবাদী। (এ পর্যন্ত কথোপকথন সমাপ্ত হল এবং তওহীদ ও পুনরুত্থান প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তওহীদের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিশিষ্টে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি (যেমন মুশরিকরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে একথা বলে) তাঁর সাথে কোন মাবূদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবূদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে) পৃথক করে নিত এবং (দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে একজন অপরজনের ওপর আক্রমণ করত! এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধ্বংসলীলার শেষ থাকত না; কিন্তু বিশ্বব্যবস্থায় এমন কোন বিশৃঙ্খলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেসব (ঘৃণ্য) কথাবার্তা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি তাদের শিরক থেকে ঊর্ধ্বে (ও পবিত্র)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আযাব, মুসীবত ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না।—(কুরতুবী)

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَإِنَّا عَلٰٓى أَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ
أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ

مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ
اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ
كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ
يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(৯৩) বলুনঃ 'হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৯৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে গোনাহ্গার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুনঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, কাফিরদের সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন ওপরে اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ থেকেও জানা যায়) তা যদি আমাকে দেখান, (উদাহরণত আমার জীবদ্দশাতেই তাদের ওপর এভাবে আসে যে, আমিও দেখি। কারণ, এই প্রতিশ্রুত আযাবের কোন বিশেষ সময় বলা হয়নি। উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে অস্পষ্ট। ফলে, উল্লিখিত সম্ভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, যদি এরূপ হয়) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দিচ্ছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (তবে যে পর্যন্ত তাদের ওপর আযাব না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই ব্যবহার করুন যে) তাদের মন্দকে এমন ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম (ও নরম। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেবেন না; বরং আমার হাতে সমর্পণ করুন) তারা (আপনার সম্পর্কে) যা বলে, সে বিষয়ে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। (যদি মানুষ হিসেবে আপনার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে)

আপনি দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে) এবং হে আমার পালনকর্তা, আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (প্ররোচিত করা তো দূরের কথা। এই দোয়ার ফলে ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। কাফিররা তাদের কুফর ও পরকালের অস্বীকৃতি থেকে বিরত হবে না; এমনকি) যখন তাদের কারও মাথার ওপর মৃত্যু এসে (দণ্ডায়মান হয় এবং পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্খতা ও কুফরের কারণে অনুতপ্ত হয়ে) বলে হে আমার পালনকর্তা. (মৃত্যুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং) আমাকে (দুনিয়াতে) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) আমি ছেড়ে এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে) সৎ কাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি ও ইবাদত করি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলছেন ঃ) কখনও (এরূপ হবে) না, এ তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। (তা বাস্তবে পরিণত হবে না। কারণ,) তাদের সামনে এক আড়াল (আযাব) আছে (যার আসা জরুরী। এটাই দুনিয়াতে ফেরত আসার পথে বাধা। অর্থাৎ মৃত্যু। এই মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে। وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ---মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আল্লাহ্র আইনের খেলাফ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফিরদের ওপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের ওপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে ঃ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ---অর্থাৎ এমন আযাবকে ভয়

কর, যা এসে গেলে শুধু জালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ্, যদি তাদের ওপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের ওপরই আসে, তবে আমাকে এই জালিমদের সাথে রাখবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন।---(কুরতুবী)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَنَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ---অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের ওপর আযাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরাপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের ওপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেনঃ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ---অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের ওপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনেই তাদের ওপর পতিত হয়েছিল।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ---অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে; যেমন কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও

তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই ঃ

فَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ○ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

هَمز শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেওয়া। পশ্চাদ্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বেকাবু হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালিদ (রা)-এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-তাঁকে এই দোয়া পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই ঃ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ

وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ -

أَنْ يَحْضُرُونِ ---সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।---(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْجِعُونِ ---অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফির ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎ কর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়তে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব?

আমাকে এখন আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, رَبِّ ارْجِعُونِ অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

برزخ-এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই আইন।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾
فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾
قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ
تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

(১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহ্‌গার হব। (১০৮) আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমর ধিক্কৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমন কি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের গণনায়। (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে! (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হবে যে,) তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনও সেদিন (যেন) থাকবে না। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না; অপরিচিতের মত ব্যবহার করবে।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (যে, ভাই, তুমি কি অবস্থায় আছ? মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিচয় কাজে আসবে না। সেখানে

একমাত্র ঈমানই হবে উপকারী বিষয়। এর প্রকাশ্য পরিচিতির জন্য একটি পাল্লা খাড়া করা হবে এবং তাতে ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে।) অতএব যাদের পাল্লা (ঈমানের) ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত) হবে (এবং মু'মিনগণ উপরোক্ত ভয়ভীতি ও অজিজ্ঞাসামূলক অবস্থার সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ্ বলেনঃ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা হবে, (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। (জাহান্নামের) অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেনঃ) কেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হত না কি? আর তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (এটা তারই শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছ।) তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (বাস্তবিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং (নিঃসন্দেহে) আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্বীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা ও ওযরখাহী করে আবেদন করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ (জাহান্নাম) থেকে (এখন) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন;) যেমন সূরা সিজদায় আছে فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা পুরাপুরি দোষী (তখন আমাদেরকে খুব শাস্তি দেবেন। এখন ছেড়ে দিন)। আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহান্নামেই) পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামঞ্জুর। তোমাদের কি মনে নেই যে,) আমার বান্দাদের এক (ঈমানদার) দলে বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা (শুধু এই কথার ওপর যারা সর্বাবস্থায় উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ছিল,) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করেছিলে, এমন কি তা (অর্থাৎ এই বৃত্তি) তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য করতে। (অতএব তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কষ্টের জন্য সবর করতে হয়েছে মাত্র। এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (আর তোমরা এহেন অকৃতকার্যতায় গ্রেফতার হয়েছ। জওয়াবের উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা করা হবে---তোমাদের অন্যায় এরূপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দাও কেমন, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও প্রিয় বান্দা। তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করায় বান্দার হক নষ্ট হয়েছে এবং ঠাট্টার আসল লক্ষ্য সত্যকে মিথ্যা বলায় আল্লাহ্র হক নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও পূর্ণ শাস্তিই উপযুক্ত। তাদের সামনে মুমিনদেরকে জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করাও

কাফিরদের জন্য একটি শাস্তি। কেননা, শত্রুর সফলতা দেখলে অত্যধিক পীড়া অনুভূত হয়। এ হচ্ছে তাদের আবেদনের জওয়াব। অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম যে বাতিল তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে লান্ছনার ওপর লান্ছনা ও পরিতাপের ওপর পরিতাপ হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র হয়ে যায়। তাই) বলা হবেঃ (আচ্ছা বল তো,) তোমরা বছরের গণনায় কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ? (যেহেতু কিয়ামতের দিন ভয়ভীতির কারণে তাদের হুঁশ-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘও দৃষ্টিতে থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি (সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই), আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর হিসাব রাখে) জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ্ বললেনঃ (একদিন ও দিনের কিছু অংশ ভুল; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে এতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে,) তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ; কিন্তু ভাল হত যদি তোমরা (একথা তখন) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে। কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেছ এবং এ জগতকে অস্বীকার করেছ। وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

এখন ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক মনে করছ; কিন্তু বেকার। বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমূহে কিয়ামত ও তাতে আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়েছিলাম, তখনই মানব সৃষ্টির অন্য রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কিয়ামত অস্বীকার করা ছিল অতি জঘন্য ব্যাপার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ——কিয়ামতের দিন দু'বার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কোরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিংগার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার——এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে

জুবায়রের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সন্তুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য ঃ কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে---মুমিনগণের নয়। কারণ, ওপরে কাফিরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

---অর্থাৎ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্ তা'আলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যই। ---(মাযহারী)

এমনিভাবে হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না)---আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলিমগণ বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর

বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না ; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা। মু'মিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ—অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।—(মাযহারী)

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফিরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গোনাহ্‌র পাল্লায় কোন ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতই হাল্কা হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। কামিল মু'মিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হল। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোন গোনাহ্ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা